উপসংহার

'নজরুল জীবন ও দেশ-কাল', 'নজরুল কথাসাহিত্যে দেশ-কাল', 'নজরুলের কবিতায় ও গানে দেশ-কাল', 'নজরুল নাটকে-চলচ্চিত্রে দেশ-কাল', এবং 'দেশ-কালের প্রেক্ষিতে নজরুলের সাংবাদিক প্রবন্ধমালা, প্রবন্ধ সাহিত্য'—অভিসন্দর্ভের এই শিরোনাম যুক্ত পূর্ববর্তী চারটি অধ্যায়ের সুদীর্ঘ আলোচনায় নজরুলের জীবন, সমকাল, ইতিহাস, সাময়িক চৈতন্য, আবেগ ও ঘটনাপ্রবাহ এবং এই সমস্ত কিছুর প্রেক্ষিতে সমগ্র সৃষ্টির স্বরূপ উন্মোচনের মধ্যে নজরুল সাহিত্যে দেশ-কাল 'এর পরিচয় উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস যেমন রয়েছে, তেমনি দেশ-কাল 'এর আলোকে তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মূল্যায়নেরও চেষ্টা হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব; নির্দিষ্টভাবে বললে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালপরিধির মধ্যে নজরুলের যা কিছু সৃষ্টি। ১৯৪২-এর পরেও অবশ্য নজরুল বেঁচে রইলেন দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর, তবে সৃষ্টির ক্ষমতা হারিয়ে। জীবন্মৃত হয়ে। এই দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর বেঁচে থাকা স্থবির মানুষটি যদি প্রত্যেক বছরে নিদেনপক্ষে একটি কবিতা, কিম্বা একটি গানও রচনা করে যেতেন তবে তা আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ রূপেই বিবেচিত হতো। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ ক্ষতি অপূরণীয়। তবে শুধু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, বাঙালির সমাজ-ধর্ম-রাজনীতি, এমনকি বাঙালির সামগ্রিক জীবন পরিধিতেও এই এতগুলো বছর তাঁর থেকেও না থাকার ক্ষতিকে কোনো ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কারণ কবি বা সুরকার-গীতিকার, সম্পাদক-সাংবাদিক, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার—কেবল এই সব পরিচয়ের মধ্যে আমরা কখনই নজরুলকে আবদ্ধ করতে পারি না। মানছি, সাহিত্যের-সংগীতের ক্ষেত্রে তিনি একজন স্রষ্টা এবং এই পরিচয়েই তাঁর পরিচিতি, খ্যাতি। আমাদের আলোচনাও নজরুলের এই সৃষ্টিকে নিয়ে। তবুও তিনি শুধু সাহিত্যিক নন, সংগীত রচয়িতা বা সুরকার নন। নজরুলের জীবন ও সাহিত্যের বিস্তারিত আলোচনায় একথা প্রমাণিত, শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতা অপেক্ষা দেশ-কাল 'এর প্রতি দায়বদ্ধতা তাঁর অনেক গভীর এবং ব্যাপক।

Art for art sake : শিল্পের জন্য শিল্প—কলাকৈবল্যবাদীদের এই মতকে সবক্ষেত্রে নজরুল কখনই প্রাধান্য দেন নি। তাঁর কাছে সত্যের প্রকাশেই সৃষ্টি হয় শিল্প এবং স্রষ্টার সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর প্রাণের সত্য অভিব্যক্তি। এই সম্পর্কে তাঁর বিস্তারিত অভিমত, 'আর্ট' এর অর্থ সত্যের প্রকাশ (execution of truth), এবং সত্য মাত্রেই সুন্দর, সত্য চিরমঙ্গলময়। আর্টকে সৃষ্টি, আনন্দ, বা মানুষ এবং প্রকৃতি (man puls nature) ইত্যাদি অনেক কিছু বলা যাইতে পারে; তবে সত্যের প্রকাশই হইতেছে ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।'[১] সমগ্র সৃষ্টির ক্ষেত্রেও নজরুল এই ভাবনার দ্বারা চালিত হয়েছেন। তাঁর অন্তরের কষ্টিপাথরে যাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকেই তিনি প্রকাশ করেছেন। বিবেক'ই তাঁর নেতা। বিবেক'এর দ্বারা নির্দেশিত পথেই তাঁর যাত্রা। স্রষ্টার মন-মানসিকতা এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে নজরুল যা ভেবেছিলেন এই প্রসঙ্গে তা উদ্ধারযোগ্য—

" ...সাহিত্যিকের, কবির, লেখকের প্রাণ হইবে আকাশের মতো উন্মুক্ত উদার, তাতে কোনো ধর্মবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, বড়ো-ছোটো জ্ঞান থাকিবে না। বাঁধ-দেওয়া ডোবার জলের মতো যদি সাহিত্যিকের জীবন পঙ্কিল, সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্য সাধনা সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হইবে। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য আঁতুড়-

ঘরেই মারা যাইবে। যাঁহার প্রাণ যত উদার, যত উন্মুক্ত, তিনি তত বড়ো সাহিত্যিক। কারণ, সাহিত্য হইতেছে বিশ্বের, ইহা একজনের হইতে পারে না। সাহিত্যিক নিজের কথা নিজের ব্যথা দিয়া বিশ্বের কথা বলিবেন, বিশ্বের ব্যথায় ছোঁওয়া দিবেন। সাহিত্যিক যতই কেন সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করুন না, তাহা দেখিয়াই যেন বিশ্বের যে কোনো লোক বলিতে পারে, ইহা তাঁহারই অন্তরের অন্তরতম কথা; ইহা তাঁহারই বুকে গুমরিয়া মরিতেছিল, প্রকাশের পথ পাইতে ছিল না। এইরূপেই বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টি হয়, ইহাকেই বলে সাহিত্যে সার্বজনীনতা।"[২]

—এই সার্বজনীনতাকেই নজরুল তাঁর সাহিত্যে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন নিজের কথায় বহুজনের কথাকে প্রকাশ করতে। 'স্বপন-বিহারী'র মতো পৃথিবীর ঊর্ধ্বে উঠে স্বর্গের সন্ধান করতে নজরুল চান নি, 'মাটির দুলাল' হয়ে এই মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় আঁকড়ে ধরে 'দুঃখের ধরণী'তে স্বপ্নের স্বর্গকে নামাতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন সেই স্বপ্নের স্বর্গকে মাটির মায়ের দাসী করতে। এই প্রসঙ্গে তাঁর স্বীকারোক্তি, 'আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তার চোখে চোখ ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে, তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ-ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেখার স্তব-স্তুতি।'[৩] ফলে স্বপ্ন আর সত্যের বন্ধনে গড়ে উঠল নজরুলের সৃষ্টি।

তিনি রোমান্টিকতাকে অস্বীকার করেন নি, আবার বাস্তবতাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন প্রবলভাবে। 'নেগুচি, ইয়েট্‌স, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি dreamers স্বপ্নচারী' তাই যেমন তাঁর আদর্শ, তেমনি গোর্কি, বালজাক, যোহান বোয়ার, বার্নার্ড শ', বেনাভাঁতে'র সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে লিওনিঁদ, আঁদ্রিভ, ক্লুট হামসুন, ওয়াদিশ্‌ল, রেমঁদ, হুইটম্যান, গার্সিয়া লরকা'র সহযাত্রী তিনি।

কোনো রচয়িতাই যুগ বা কাল নিরপেক্ষ নন। শুধুমাত্র স্বাতন্ত্র্যের জোরে কেউই পারেন না সমকাল বা যুগের চাহিদাকে বিসর্জন দিতে। কারণ দেশ-কাল 'এর মধ্যেই থাকে তাঁর রচনার রসদ। প্রকাশটাই তাঁর নিজস্বতা। সেখানেই স্রষ্টা স্বতন্ত্র। তাই সমস্ত স্রষ্টার সৃষ্টিতে কোনো না কোনো ভাবেই দেশ-কাল 'এর কথা থাকবেই। তবে কেউ-কেউ তাঁদের রচনায় দেশ-কাল'কেই প্রাধান্য দেন, অগ্রাধিকারে প্রকাশ করেন; যেমন যুগোশ্লাভিয়ার ক্রোশিয়ান কবি ভ্লাদিমির নজর, স্পেনের গার্সিয়া লরকা, আমেরিকার কবি হুইটম্যান, আয়র্ল্যান্ডের কবি ইয়েট্‌স, ইংরেজ কবি কিপলিং এবং এঁদের মতোই নজরুলও এই বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র এক স্রষ্টা। বলা যায়, সৃষ্টির মধ্যে সার্থকভাবে দেশ-কাল'এর প্রকাশে বাংলা সাহিত্যে তিনি আজও প্রায় এক, অদ্বিতীয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নজরুল সাহিত্যে দেশ-কাল 'এর অন্বেষণে তাঁর কালজ্ঞান ও ইতিহাস চেতনা আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করেছে। তাঁর রচনা হয়ে উঠেছে সমকালীন রাজনীতি-আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্বস্ত চিত্রণ। যথাযথ মূল্যায়ন।

যথার্থ অর্থেই, নজরুল দেশ-কাল 'এর সন্তান।

'বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরি অভিযান-সেনাদলের তূর্য-বাদকের একজন আমি—এই হোক আমার সবচেয়ে বড়ো পরিচয়।'[৪] নজরুল কথিত এই দু'টি বাক্যের প্রথমটি ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সেই সময়ের বাংলাসাহিত্যের বহু রচয়িতার ক্ষেত্রে সত্য; বহুজনেই সেই 'অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে' জন্মগ্রহণ করলেও সেই সময়ের 'অভিযান সেনাদলের তূর্য-বাদক' বলতে হাতে গোনা কয়েকজন এবং যাঁদের

মধ্যে নজরুল অবশ্যই অগ্রগণ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে, বিশেষকরে ১৯১৯ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে ঘটে যাওয়া অসহযোগ, খিলাফৎ, স্বরাজ, আইন অমান্য, সন্ত্রাসবাদী—সব আন্দোলনেরই তিনি শরিক। এই সময়ের প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নজরুল রচনা করেছেন অসংখ্য কবিতা, গান, প্রবন্ধ-নিবন্ধ। এমন কি, নজরুলের কথাসাহিত্যও শিল্পগুণ, সাহিত্যরসকে অক্ষুণ্ণ রেখেই হয়ে উঠেছে তাঁর এই সময়ের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার বাহন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণীয়, সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়াও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনিও একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। সৈনিক।

এই সময়ের 'চারণ কবি' তিনি'ই।

তবে নজরুলের সজ্ঞান, জীবিতাবস্থায় এবং পরবর্তীকালে সমালোচকেরা বিশেষকরে তাঁর কবিতা ও সংগীতে এই রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রসঙ্গ উত্থাপন ও সাময়িকতার উল্লেখ করে তাঁকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের বলে চিহ্নিত করেছেন। আমরা দেখলাম, নজরুলও তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতার অভিযোগ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকেও নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমানেই সচেতন ছিলেন, এবং নিজের আদর্শে অবিচল থেকে কোনো মতামতের পরোয়া না করেই তাঁর আদর্শানুসারী সৃষ্টিকর্মে লিপ্ত থেকেছেন।

নজরুলের জীবন ও সাহিত্যের আলোচনায় একটা কথাই এই প্রসঙ্গে বার বার মনে হয়েছে : সত্যিই বাঁধন-হারা'র মতো তাঁর জীবন। জাত বোহেমিয়ানের মতো স্বভাব উদাসীনতায় জীবনকে নজরুল অগোছালো করেছেন। বেহিসেবি থেকেছেন। সমালোচকেরা তাঁর এই খাপছাড়া জীবনের আলোকে সৃষ্টিকে দেখেছেন এবং সেই জীবনের সঙ্গে সাময়িকতার আবেগ যোগে তাঁর সৃষ্টিকে কাল-অনুত্তীর্ণের ঘোষণা করেছেন। এমন কি, নজরুলের এই সমস্ত রচনার আবেদনের ক্ষেত্রে তাঁরা নির্দিষ্ট সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছেন। অথচ নজরুলের রচনার গভীরতর বিশ্লেষণে, এই সিদ্ধান্তেই স্থিরীকৃত হতে হয়, তিনি জীবনে বেহিসেবি হলেও সৃষ্টির ক্ষেত্রে কখনও কোনো আপোষ করেন নি, তাৎক্ষণিক আবেগে কোনো কিছু সৃষ্টি করলেও তা তাৎক্ষণিক হয়ে ওঠে নি। আর উত্তরকালের ইতিহাস সাক্ষী, সমালোচকদের সেই সময়সীমা লঙ্ঘন করেই নজরুলের রচনা কালোত্তীর্ণ।

আসলে যুগের দাবিকে নজরুল অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন; দেশ-কালকে অস্বীকার করে চাননি ভবিষ্যতের কবি হতে। চাননি বলেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য নজরুল লিখেছেন। পরাধীনতার বেদনা-যন্ত্রণাকে বিষয় করেছেন তাঁর লেখায়। লেখার মধ্যে দিয়ে তিনি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন, সমালোচনা করেছেন, আক্রমণ করেছেন সাম্রাজ্যলোভী ব্রিটিশ শক্তির। ফলে তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার, কাটাতে হয়েছে কারাগারে। তাঁরই লেখা বই বার বার বাজেয়াপ্ত করেছে ব্রিটিশ সরকার। আর এই সবই তো সাক্ষ্য দেয় নজরুলের রচনা কতটা দেশ-কালকে ধারণ করেছে। তবে নজরুলের রচনা শুধু পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন, বিদ্রোহ-বিপ্লবের প্রসঙ্গেও রচিত—যা আমরা আলোচনা করেছি।

আবার শ্রেণী বিভক্ত সমাজের নানা বৈষম্য ও অবিচারকে নজরুল তাঁর রচনায় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন এবং সামাজিক ক্ষেত্রে এই সব নানাবিধ অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও কোনো কুসংস্কার-ভন্ডামিকে প্রশ্রয় দেন নি। ব্যক্তিগত জীবনে নজরুল যেমন ধর্মের কোনো সংকীর্ণ গন্ডীতে আবদ্ধ থাকেন

নি, তেমনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করেছেন সব ধর্মের সার সত্যকে। প্রাধান্য দিয়েছেন মানবধর্মকে। এই প্রসঙ্গে নজরুলের বক্তব্য স্মরণীয়—

'...আমি বিদ্রোহ করেছি—বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে—যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন-পচা সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভন্ডামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। হয়ত আমি সব কথা মোলায়েম করে বলতে পারিনি, তলোয়ার লুকিয়ে তার রুপার খাপের ঝক্‌মকানিটাকেই দেখাইনি—এই তো আমার অপরাধ। এরই জন্য তো আমি বিদ্রোহী। আমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, সমাজের সকল কিছু কুসংস্কারের বিধি-নিষেধের বেড়া অকুতোভয়ে ডিঙিয়ে গেছি, এর দরকার ছিল মনে করেই।'[৫]

—নজরুলের এই স্বীকারোক্তি তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে বুঝতে সাহায্য করে এবং এই উক্তির আলোকেই মনে হয় তাঁর রচনার বিচার বাঞ্ছনীয়। তিনি সময়ের প্রেক্ষিতে, দেশ-সমাজ-ধর্ম এবং মানবজীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন বিবেচনা করেছিলেন তাই তাঁর রচনায় প্রকাশ করেছিলেন। নজরুলের সেই প্রকাশে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। তিনি নিজেই এই সম্পর্কে জানিয়েছেন, 'কাব্য ও সাহিত্যে আমি কি দিয়েছি, জানি না। আমার আবেগে যা এসেছিল, তাই আমি সহজভাবে বলেছি, আমি যা অনুভব করেছি, তাই আমি বলেছি। ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না।'[৬]

সমকাল, ইতিহাস এবং ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ থেকে সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহ করলেও নজরুল মূলত মানুষের কথাই বলেছেন। মানবপ্রেমেই তিনি বিদ্রোহী। মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের নানা অন্যায়-অত্যাচারে তিনি প্রতিবাদী। স্বদেশের স্বাধীনতা তাঁর লক্ষ্য, সমাজ-ধর্মের সার্বিক উন্নতিই তাঁর আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু এই সব কিছুর মূলেই আছে মানুষ—মানুষের কল্যাণ। 'কুহেলিকা' উপন্যাসে প্রমত্তের কণ্ঠে প্রকাশিত তার স্রষ্টার স্বরকে আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি—

'আমার ভারত এ-মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয় রে অনিম! আমি তোমাদের চেয়ে কম ভাবপ্রবণ নই, তবু আমি শুধু ভারতের জল-বায়ু-মাটি-পর্বত-অরণ্যকেই ভালোবাসিনি! আমার ভারতবর্ষ—ভারতের এই মূক-দরিদ্র-নিরন্ন-পর-পদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া নয়, হিন্দুস্থান নয়, গাছপালার ভারতবর্ষ নয়,—আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে-যুগে-পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন তীর্থ। কত অশ্রু সাগরে চড়া পড়ে পড়ে উঠল আমার এই বেদনার ভারতবর্ষ! ওরে, ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয়—এ আমার মানুষের—মহা-মানুষের ভারতবর্ষ!'[৭]

—এই 'মানুষের—মহা-মানুষের ভারতবর্ষ' নির্মাণে নজরুল ছিলেন নিয়োজিত এবং এই স্বপ্নের সার্থকতায় তাঁর সৃষ্টিকে করেছিলেন নিবেদিত। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি মানুষকে মেলাতে চেয়েছেন। অখন্ড মানবসত্তার এক গভীরতর বোধ থেকে নজরুল স্বদেশ, স্বদেশের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বের মানুষকে শোনাতে চেয়েছেন মানব-মিলনের সুর—

'সকল কালের সকল দেশের
সকল মানুষ আসি,
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোনো
এক মিলনের বাঁশি।'[৮]

নজরুলের মানবতা প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক। জাতি-ধর্ম-বর্ণ এবং দেশ নিরপেক্ষ ভাবে মানুষকে ভালোবেসেছিলেন। সেই ভালোবাসা থেকেই উৎসারিত হয়েছে তাঁর যা কিছু সৃষ্টি। কোনো ভৌগোলিক সীমায়, কোনো সমাজের সংকীর্ণ গন্ডীতে আবদ্ধ থাকেন নি বলেই তিনি সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি।'[৯] নজরুলের এই বক্তব্যই যথাযথভাবে তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত। দেশের স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন, বিদ্রোহ-বিপ্লবকে সমর্থন করলেও মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপেক্ষা তাই তাঁকে অধিক গুরুত্ব দিতে দেখি মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির, মৌলিক চাহিদার; খাদ্য-বস্ত্রের প্রয়োজনের—

'ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন।
বেলা বয়ে যায়, খায়নি'ক বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন!
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান তুমি আজিও আছ কী? কালি ও চুন
কেন ওঠে না ক' তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন?'[১০]

আর, তাঁর যা কিছু প্রতিবাদ মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন, অত্যাচার; সামাজিক ক্ষেত্রে অসাম্য, ভেদ; ধর্মের নামে ভন্ডামি, অবিচার এবং মানুষের প্রতি অবহেলা, অনাদর অশ্রদ্ধার বিরুদ্ধে— যা আজও সতত সর্বত্র বিরাজিত। ফলে নজরুলের সাহিত্য তাঁর সময়ের সীমায়, একটি নির্দিষ্ট কালের গন্ডীতে আবদ্ধ না থেকে তা যেমন সময়ের প্রবহমান ধারায়, বৃহত্তর কালখন্ডে প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে, তেমনি স্বাধীনতা প্রাপ্তির এতবছর পরেও ভারতবর্ষে, ভারতীয় উপমহাদেশে, এমনকি এই উপমহাদেশ ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বে এখনও নিঃশেষিত হয় নি তাঁর রচনার প্রয়োজন, ফুরিয়েও যায় নি তাঁর কবি-কর্মের আবেদন, সৃষ্টির মূল্য।

উল্লেখপঞ্জি

১. কাজী নজরুল ইসলাম, বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলমান, যুগবাণী, নজরুল-রচনাবলী, প্রথমখণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ. ৮২১।

২. তদেব।

৩. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৯১।

৪. তদেব।

৫. তদেব, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮।

৬. তদেব, পৃ. ১১০।

৭. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৫২।

৮. তদেব, কুলি-মজুর, সাম্যবাদী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৪৭।

৯. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৯১।

১০. তদেব, আমার কৈফিয়ত, সর্বহারা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯৪।